DR. DIBAKAR MANNA,
ASSISTANT PROFESSOR,
TARAKESWAR DEGREE COLLEGE

‘কারণ’ কি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর ? মিল তাঁর আরোহ পদ্ধতিগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ‘কারণ’ শব্দটিকে কি অর্থে ব্যবহার করেছেন ?

মিল প্রধানতঃ দুটি অর্থে কারণ শব্দটি ব্যবহার করেছেন ।

প্রথমতঃ- ‘কারণ’ বলতে তিনি দেখিয়েছেন যে, কার্যের শর্তান্তরহীন,নিয়ত, অপরিবর্তনীয়, অব্যবহিত, পূর্ববর্তী ঘটনাই কারণ ।

দ্বিতীয়তঃ-মিল দেখিয়েছেন যে, কারণ হল কার্যের সকল সদর্থক শর্ত ও নঞর্থক শর্তের সমষ্টি।

কারণ হতে গেলে অবশ্যই পূর্ববর্তী ঘটনা হতে হবে। কিন্তু যেকোন পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণ বলা হলে **‘কাকতালীয় দোষ’** বা Post hoc ergo propter hoc fallacy হয়। সুতরাং কারণ হতে গেলে নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা হতে হবে। কিন্তু যেকোন নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনাই কারণ নয়। দিন রাত্রির নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা, অনুরূপভাবে জোয়ার ভাটার, শীত বসন্তের কারণ বলা হলে একই কারণের দ্বারা উৎপন্ন দুটি কার্যের অর্থাৎ যুগ্ম কার্যের একটিকে কারণ এবং অপরটিকে কার্য বলা দোষে দুষ্ট হতে হয়।

মিল তাই শর্তান্তরহীন, নিয়ত, পূর্ববর্তী ঘটনাকেই কারণ আখ্যা দিতে চেয়েছেন। অবশ্য তিনি আরো বলেছেন যে, শর্তান্তরহীন পূর্ববর্তী ঘটনা যেন দূরবর্তী হলে মাঝখানে আরো কিছু ঘটনা ঘটতে পারে যার জন্য কার্য সম্ভব হতে পারে । তাই মিল এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, কারণ হতে গেলে তাকে শর্তান্তরহীন ,নিয়ত,অপরিবর্তনীয় ,অব্যবহিত ,পূর্ববর্তী ঘটনা হতে হবে।

লৌকিক অর্থে কারণকে কখনও কখনও কোন সদর্থক শর্ত বা কোন নঞর্থক শর্তের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। যেমন –নৌকাযোগে নদী পার হতে গিয়ে ঝড়ে নৌকাডুবি হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে কিছু ব্যক্তি বলতে পারেন যে , ঝড় ওঠাই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ । কেউ বা ব্যক্তিটির সাঁতার না জানাকে বা কাছাকাছি কোন সাঁতার জানা না থাকাকে বা জলের গভীরতাকে কারণ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারেন । কিন্তু এইভাবে কোন সদর্থক বা নঞর্থক শর্তকে কারণ বলা হলে ‘একটি শর্তকে সমগ্র কারণ বলে ভুল করা দোষে দুষ্ট হতে হয়’।

কারণকে কখনও কখনও আবশ্যিক শর্ত, কখনও কখনও বা পর্যাপ্ত শর্ত অর্থেও গ্রহণ করেন। সূর্যকিরণ গাছপালার জন্মবৃদ্ধির কারণ–এখানে কারণ শব্দটিকে আবশ্যিক শর্তে গ্রহণ করা হয়েছে । কেননা , সূর্যকিরণ না থাকলে গাছপালার জন্মবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু সূর্যকিরণ থাকলেই যে , গাছপালার জন্মবৃদ্ধি হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যখন 'ক' না ঘটলে 'খ' ঘটে না , তখনই 'ক' –কে 'খ'-এর আবশ্যিক শর্ত বলা হয়।

আবার যখন 'ক' ঘটলেই 'খ' ঘটে, তখন 'ক'-কে 'খ'-এর পর্যাপ্ত শর্ত বলা হয়। যেমন- বিষপান মৃত্যুর কারণ। এখানে 'কারণ' শব্দটিকে পর্যাপ্ত শর্ত হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

কারণকে কখনও কখনও সন্নিহিত কারণ, কখনও দূরবর্তী কারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়। মনে করা যাক, রামবাবুর মোটর গাড়িটি মোটা টাকার বীমা করা আছে এবং সেই গাড়িটি আগুন লেগে একেবারে পুড়ে গেল। কি করে আগুন লাগলো তা তদন্ত করার জন্য বীমা কোম্পানী একজন তদন্তকারী অফিসারকে পাঠাল। এখন তদন্তকারী অফিসার যদি বলে যে, আবহাওয়ায় অক্সিজেনের উপস্থিতিতেই গাড়ীটিতে আগুন লাগার কারণ, তাহলে তার কথাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কারণ অক্সিজেনের উপস্থিতি আগুন লাগার আবশ্যিক শর্ত, কেননা আবহাওয়ায় অক্সিজেন না থাকলে আগুন লাগতে পারে না। কিন্তু তদন্তকারী অফিসারের এই অনুসন্ধান বীমা কোম্পানীকে নিশ্চয়ই খুশী করতে পারবে না। বরং তদন্তকারী অফিসার তিরস্কৃত হবে। কারণ বীমা কোম্পানী এই অর্থ বোঝেন নি। আবার বীমা কোম্পানী আগুন লাগার পর্যাপ্ত শর্তও জানতে আগ্রহী নন। সুতরাং বীমা কোম্পানী এখানে কারণ শব্দটিকে তৃতীয় একটি অর্থে ব্যবহার করেছে। বীমা কোম্পানী যা জানতে চায় তা হল– সেই ঘটনা যা অন্যান্য স্বাভাবিক শর্তের উপস্থিতি সত্ত্বেও মোটর গাড়ীতে আগুন লাগার জন্য দায়ী , যে ঘটনা না ঘটলে মোটর গাড়ীতে আগুন লাগত না। ধরা যাক, সেই কারণটি হল – রামবাবু বীমার টাকা পাবার জন্য নিজেই তার গাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেন।

এই তৃতীয় অর্থে কারণকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় – সন্নিহিত কারণ ও দূরবর্তী কারণ। সন্নিহিত কারণ হল রামবাবু নিজে অগুন লাগিয়েছেন। কিন্তু এমন হতে পারে যে, রমবাবু যে ছোট যন্ত্রপাতির দোকান আছে তাতে ইদানিং ক্ষতি হচ্ছে এবং সেই ক্ষতিপূরণ করার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর মোটর গাড়ীতে আগুন লাগিয়ে বীমার টাকা তুলতে চান। অবার ব্যবসায় ক্ষতি হবার কারণ হয়ত যন্ত্রপাতির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি এবং যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধির কারণ হল সেইসব যন্ত্রপাতি যেসব কারখায় তৈরী হয় সেখানকার লাগাতার শ্রমিক ধর্মঘট। এক্ষেত্রে শ্রমিক ধর্মঘট হল রামবাবুর মোটর এ অগুন লাগাবার 'দূরবর্তী কারণ' বীমা কোম্পানী স্পষ্টতঃ এই দূরবর্তী কারণে আগ্রহী নয়।

মিলের অন্বয়ী পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা দেখা যায় যে , সেখানে তিনি সাধারণ পূর্ববর্তী ঘটনা (A) কে সাধারণ পরবর্তী ঘটনা (a) এর কারণ বলেছেন। অর্থাৎ তিনি অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনাকেই কারণ আখ্যা দিতে চেয়েছেন এবং তার জন্য কখনও কখনও কাকতালীয় দোষ, কখনও বা যুগ্ম কার্যের একটিকে অপরটির কারণ বলে ভুল করা দোষে দুষ্ট হয়েছে।

মিলের ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে , সেখানে একটি অপরিহার্য শর্তকে সমগ্র কারণ বলা দোষে দুষ্ট হয়েছে। নানাপ্রকার মসলা সংযুক্তরান্না করা আকর্ষণীয় মাংস খেতে গিয়ে যখন দেখা গেল যে তা বিস্বাদ হয়েছে ,তাখন উপযুক্ত পরিমাণ লবণ মিশিয়ে দেখা গেল যে তা সুস্বাদ হয়েছে। এখানে ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করে বলা হয় যে, লবণই সুস্বাদুর কারণ।

এইভাবে ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে একটি অপহার্য শর্তকে সমগ্র কারণ বলে চিহ্নিত করা জনিত দোষে দুষ্ট।

অন্যান্য পদ্ধতি যথা অন্বয়ী ব্যতিরেকী, সহপরিবর্তন এবং পরিশেষ পদ্ধতি যেহেতু অন্বয়ী পদ্ধতি বা ব্যতিরেকী পদ্ধতিরই প্রকারভেদমাত্র। সেহেতু মিল উক্ত পদ্ধতিগুলিতেও অনুরূপ দোষ করেছেন।

মিল যখন বহুকারণবাদ প্রচার করেন তখনও তিনি অবৈজ্ঞানিক মতের প্রশ্রয় দিয়েছেন। বহুকারণবাদে বলা হয় যে, একই কারণের দ্বারা একই কার্য উৎপন্ন হলেও একই কার্য কখনও একই কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয় না । ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্নভিন্ন কারণের দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে। যেমন- মৃত্যু কার্যটি কখনও ব্যধি, কখনও বিষপান, কখনও অগ্নিকাণ্ডে, কখনও বা জলমগ্ন হয়ে, আবার কখনও বা অন্য কোন দুর্ঘটনার দ্বারা ঘটতে পারে । কিন্তু মিল এই সকল ক্ষেত্রে কারণকে বিশেষভাবে দেখেছেন বটে , কিন্তু কার্যকে সাধারণভাবে দেখেছেন। যদি কার্যের মত কারণকেও সাধারণভাবে দেখতেন, তাহলে দেখা যেত মৃত্যুর প্রতিটি ক্ষেত্রেই হৃতযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াই একমাত্র কারণ। আবার কারণের মত কার্যকেও তিনি যদি বিশেষভাবে দেখতেন,তাহলে দেখা যেত যে জলমগ্ন হয়ে যে মৃত্যু তার চেহারা অগ্নিদাহ জানিত চেহারা থেকে পৃথক ইত্যাদি। সুতরাং বৈজ্ঞানিক অর্থে গ্রহণ করলে বলতে হয় যে, একই কারণের দ্বারা যেমন একই কার্য উৎপন্ন হয়, তেমনি একই কার্য একই কারণের দ্বারাই উৎপন্ন হয়, ভিন্ন ভিন্ন কারণের দ্বারা নয়।

সপ্তকাণ্ড পদ্ধতি

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কার্য অথবা রহস্যসন্ধানীর অনুসন্ধান কার্য যে সাতটি পদ্ধতির সাহায্যে পরিচালিত হয়, তা নিম্নরূপঃ-

(১) **সমস্যা (The problem):-** বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কার্যই হোক বা কোন অপরাধমূলক অনুসন্ধান কার্যই হোক, কোনটিরইশুরু হতে পারে না যদি কোন সমস্যা দেখা না দেয় । অবশ্য সাধারণ মানুষ যে সব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরিচিত বিষয়ই দেখে, বৈজ্ঞানিক বা রহস্যসন্ধানী সেখানে সমস্যার সন্ধান পায়। সমস্যা হোল কোন তথ্য বা ঘটনার সমষ্টি যেগুলি স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। অথচ যেগুলির কোন ব্যাখ্যা আমাদের কাছে জানা নেই । সুতরাং সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

(২) **প্রাথমিক বা কার্যকর প্রকল্প (Primary Hypotheses):**-কোন ঘটনা সম্পর্কে প্রচুর সাক্ষ প্রমাণ সংগৃহীত না হলে সেই ঘটনা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু চুরান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলেও মনে মনে একটা মতবাদ, খাড়া না করলে ঘটনাটির ব্যাখ্যার জন্য সাক্ষ-প্রমণ সংগ্রহ করাই কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই অসংখ্য ঘটনা বা তথ্যথেকে যেগুলি আলোচ্য ঘটনার ব্যাখ্যার পক্ষে বা সমস্যার সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় সেগুলিকে বেছে নিতে হয়। তাই বৈজ্ঞানিক বা রহস্যসন্ধানীকে প্রাথমিক প্রকল্পকে গঠন করতে হয়। প্রকল্প বলতে বোঝায় অসল কারণ বের করার আগে কারণটি কি হতে পারে অর্থাৎ সম্ভাব্য কারণকে বোঝায়।

(৩) **অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ (Collecting Additional Facts):**-প্রাথমিক প্রকল্প অনুসন্ধাকারীকে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করে । সাধারণ মানুষ যেসকল ঘটনার মধ্যে কোন রহস্যের সন্ধান পায় না , সুযোগ্য ও সতর্ক অনুসন্ধানী সেই সকল সাধারণ ঘটনার মধ্যেও অনেক রহস্যের সন্ধান পায়। তাই প্রাথমিক প্রকল্প যেসকল অতিরিক্ত তথ্যের সন্ধান দেয় সুযোগ্য অনুসন্ধানী সতর্ক্তার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখে। তথ্যের পরীক্ষা বা বিচারের জন্য অতিরিক্ত তথ্যগুলি নূতন নূতন প্রকল্পের ইঙ্গিত দতে পারে , যেগুলি আবার নূতন তথ্য সরবরাহ করতে পারে; সেই নূতন তথ্য আবার নূতন প্রকল্পেরও ইঙ্গিত দিতে পারে। এইভাবে বৈজ্ঞানিক বা রহস্যসন্ধানী অনুসন্ধান কার্যে অগ্রসর হয়ে থাকে।

(৪) **প্রকল্প গঠন (Formuleting the Hypothesis):-** অনুসন্ধান কার্যে বৈজ্ঞানিক বা রহস্যসন্ধানী নিজেকে নিযুক্ত করে এমন একটি স্তরে উপনিত হোন যখন তিনি উপলব্ধি করেন যে, সমস্যা সমাধানের জন্য সকল তথ্য হাতের কাছে মজুত। এখন এগুলিকে একত্রে সমন্বিত করা দরকার। এর ফালে একটি ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় যেটি সকল সংগৃহীত তথ্যের ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হবে। বস্তুতঃপক্ষে এই ধরনের ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প গঠন অনুসন্ধানকারীর সৃষ্টিশীল প্রতিভার প্রকাশক।

(৫) **অতিরিক্ত ফলাফল অবরোহ আকারে নিঃসৃত করা (Deducing further consequences):-** প্রকল্প শুধুমাত্র প্রাথমিক ঘটনাকেই ব্যাখ্যা করে না, আরো অতিরিক্ত অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা দেবার

সামর্থ্য তার থাকে। সার্থক বা যথার্থ প্রকল্প প্রাথমিক ঘটনাগুলিকে অতিক্রম করে নূতন ঘটনাবলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে , যেগুলির অস্তিত্বের কথা সাধারণ অনুসন্ধানকারী চিন্তা করতে পারে না। এইসব অতিরিক্ত ফলাফল বা পরিণামগুলির পরীক্ষা যে প্রকল্পটি এই ফলাফলগুলির দিকে অনুসন্ধানকারীর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখবে সেই প্রকল্পটিকে যথার্থ প্রকল্প বলে প্রমাণ করবে। কাজেই এই স্তরে অবরোহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমরা জানি কোন প্রকল্পের ভবিষ্যৎবাণীর শক্তি থাকা দরকার এবং এই ভবিষ্যৎবাণীর শক্তির অর্থই হোল পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনাকে প্রকল্প থেকে অবরোহের আকারে নিঃসৃত করা।

(৬) **অবরোহের দ্বারা নিঃসৃত ফলাফলের পরীক্ষা বা যাচাই (Testing the consequences):-**এই স্তরে প্রকল্পের থেকে অবরোহের আকারে নিঃসৃত ফলাফলের অর্থাৎ প্রকল্পের ভবিষ্যৎবাণীকে যাচাই করে দেখা হয়।

(৭) **প্রয়োগ (Application):** – বৈজ্ঞানিক বা রহস্যসন্ধানীর পক্ষে শুধুমাত্র ঘটনার ব্যাখ্যা করলেই কাজ শেষ হয় না। যেমন রহস্যসন্ধানী, যিনি অপরাধীর সন্ধানে নিযুক্ত তিনি তাঁর প্রকল্পকে প্রয়োগ করে অপরাধীকে গ্রেপ্তারের জন্য সচেষ্ট হন।

উপরের সপ্তকাণ্ড বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিখ্যাত রহস্যসন্ধানী শার্লক হোম্‌সের এক রহস্যভেদের কহিনী থেকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। এক দন্ত চিকিৎসক তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে পর্তুগালের একটি ছোট শহরে বেড়াতে এসে এক হোটেলে রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাতে গেলেন। পরের দিন স্বামী ও স্ত্রী যে ঘরে শুয়েছিলেন সেই ঘরে তাঁদের মৃতদেহ পাওয়া গেল। বিছায়তে পড়ে রয়েছে কিছু বমি। সিদ্ধান্ত করা হল খাদ্যে বিষক্রিয়ার জন্য তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। যে খাদ্য তারা খেয়েছে তাতে Food poisoning হওয়া স্বাভাবিক মনে করা হল। তাদের সন্তান দুটি অন্য ঘরে ঘুমাচ্ছিল। তারা কিন্তু মারা যায়নি। দন্ত চিকিৎসক মোটা টাকার দুর্ঘটনা বীমা করে ছিলেন, যে টাকার উত্তরাধিকারী ঐ ভদ্রলোকের অনাথ ছেলে দুটি। কিন্তু দুর্ঘটনা বীমার একটি শর্ত হল বীমাকারী খাদ্যে বিষক্রিয়ার জন্য যদি মারা যায় তাহলে তার উত্তরাধিকারী টাকা পাবে না।

রহস্যসন্ধানী শার্লক হোমস্ এলেন রহস্য ভেদ করার জন্য । রহস্যসন্ধানীর কাছেও প্রশ্নটি সমস্যা আকারে দেখা দিল। খাদ্যে বিষক্রিয়ার জন্যই যদি তাদের মৃত্যু হয়, তাহলে সন্তান দুটির কিছু হল না কেন ? তারাও তো একই খাদ্য খেয়েছিল।

শার্লক হোমস্ মৃতদেহগুলি ভাল করে পরীক্ষা করলেন এবং মৃতদেহের অস্বাভাবিক চেহারা দেখে তাঁর সন্দেহ হল খাদ্যে বিষক্রিয়া হেতু মৃত্যু ঘটেনি। কাজেই তিনি একটি প্রাথমিক প্রকল্প রচনা করলেন যে বিষক্রিয়ার জন্য নয়, অন্য কোন কারাণে মৃত্যু ঘটেছে।

এবার অতিরিক্ত তথ্যসংগ্রহের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি মাংসপেশী থেকে খানিকটা রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, মৃত্যুর কারণ হল কার্বণ মনোক্সাইড। তিনি এবার ব্যাখ্যা মূলক প্রকল্প গঠন করলেন যে, স্বামী স্ত্রীর মৃত্যু কার্বণ মনোক্সাইড জনিত মৃত্যু।

এবার রহস্যসন্ধানীর কাজ হল ব্যাখ্যা মূলক প্রকল্প থেকে অবরোহের আকারে কিছু সিদ্ধান্ত নিঃসৃত করা, যেগুলি প্রমাণিত হলে মূল প্রকল্পটি যথার্থ বলে প্রমাণিত হবে। কেননা, যথার্থ প্রকল্পের অবশ্যই ভবিষ্যৎবাণীর শক্তি থাকবে। শার্লক হোমস- এর প্রকল্প যে স্বামী স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ কার্বন মনোক্সাইড তাতে এবার পরীক্ষা করে দেখা হতে লাগল। শার্লক হোমস অনুমান করলেন হোটেলের স্নানাগারে জল গরম করার জন্য পাইপ আছে এবং স্নানাগারে কোন জানালা নেই। এই ঘরের মধ্যে গ্যাস পাইপ থেকে নিশ্চয়ই কার্বন মনোক্সাইড ঘরে ঢুকেছে ঘরে বাতাস প্রবেশের কোন রাস্তা ছিল না। কার্বন মনোক্সাইডের ফলে কোন মৃত্যু হলে মৃতদেহের রঙ লাল হয়ে যায়। স্বামী স্ত্রীর মৃতদেহের কাছে যে বমি দেখা গিয়েছিল তা বিষক্রিয়ার ফলে নাও হতে পারে।

এবার অনুমতি ফলাফল যাচাই করে দেখার পালা। যাচাই করে দেখা গেল স্বামী স্ত্রীর শোবার আগে স্না করার অভ্যাস ছিল। তাই জল গরম করার গ্যাস পাইপ খোলা হয়ে ছিল। তাঁরা ছিলেন ঠিক স্নানের ঘরের সংলগ্ন শয়নকক্ষে। তাঁরা পাইপ বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। স্নানাগারে কোন জানালা ছিল না এবং শোবার ঘরে বাতাস আসার রাস্তা ছিল না। সন্তান দুটি অন্য ঘরে শোয়ার জান্য জীবন রক্ষা পেয়েছে। মৃতদেহগুলির লাল রঙ হয়েছে দেখা গেল এবং তাতে আরো প্রমাণ হল যে, যে খাদ্য তারা খেয়ে ছিল সেটি বিষাক্ত নয়। সেই খাদ্য আরো অনেকে খেয়েছিল যাদের কোন ক্ষতি হয়নি।

শার্লক হোমস তাঁর মতবাদ প্রয়োগ করে প্রমাণ করলেন যে,স্বামী স্ত্রীর খাদ্যে বষক্রিয়া হেতু মৃত্যু ঘাটেনি এবং বীমা কোম্পানীও অনাথ শিশু দুটিকে টাকা দিতে বাধ্য হল।

বৈজ্ঞানিক যদি কোন সমস্যা অনুভব না করেন তবে তিনি কি নিয়ে অনুসন্ধান করবেন। সুতরাং বৈজ্ঞানক অনুসন্ধান কার্যের প্রথম স্তর সমস্যা। কোন পতনশীল বস্তু কেন সর্বদা মাটির দিকে পড়ে এই বিষয়টি সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক নিউটনের চিন্তার উদ্রেক করল । স্যার জন কেপলার বিভিন্ন সময়ে আকাশ বিভিন্ন গ্রহের অবস্থানের পরিবর্তন কেন হয় এই সম্পর্কে কতকগুলি সূত্র প্রণয়ন করেছিলেন। নিউটন একটি প্রাথমিক প্রকল্প গঠন করলেন যে, কেপলারের সূত্রগুলির সঙ্গে পৃথিবীর দ্বারা ওপর থেকে পতনশীল বস্তুকে আকর্ষণ করার কোন সম্পর্ক আছে। নিউটন আরো অতিরিক্ত তথ্যসংগ্রহে ব্রতী হলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ট্রাইকোব্রাহে বিভিন্ন সময়ে গ্রহের অবস্থান সম্পর্কে একটি মানচিত্র রচনা করলেন। পরবর্তীকালে এই বৈজ্ঞানিক জন কেপলার ও ট্রাইকোব্রাহের মানচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখেন যে, গ্রহগুলি তিনটি নির্দিষ্ট সূত্র মেনে চলে। এই সূত্রগুলি হল – প্রতিটি গ্রহ

সূর্যকে কেন্দ্র করে উপবৃত্তাকারে আবর্তিত হয় । সূর্য তার একটি নাভিতে অবস্থিত থাকে । দ্বিতীয়তঃ- প্রতিটি গ্রহ সময়ে সময়ে সমান অতিক্রম করে। তৃতীয়তঃ- যেকোন গ্রহের পর্যায়কাল বর্গগ্রহের দূরত্বের ত্রিঘাতের সমানুপাতিক।

নিউটন এবার একটি ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প রচনা করলেন। এই ব্যাখ্যামূলক প্রকল্পটি হল এই যে, বস্তুগুলির দুটির মধ্যে দূরত্ব যদি কমে যায় তাহলে আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। তার ফলে ক্ষুদ্র বস্তু বৃহৎ বস্তুর দিকে অগ্রসর হয় । এই কারণে যেকোন বস্তু পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়।

এবার নিউটন এই ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প থেকে অবরোহের আকারে কিছু সিদ্ধান্ত নিঃসৃত করলেন, যেগুলি প্রমানিত হলে মূল প্রকল্পটিও প্রমাণিত হবে। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, জড়বস্তু যদি পরস্পকে আকর্ষণ করতে পারে তাহলে বিশ্বের যেকোন দুটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করতে পারে।
এবার এই সিদ্ধান্তকে যাচাই করে দেখার পালা। তার এই সিদ্ধান্ত তিনি কেপলারের সূত্রগুলির উপর প্রয়োগ করে তাদের যাচাই করার জন্য সচেষ্ট হলেন। যাচাই করে তিনি দেখলেন যে, কেপলারের সূত্রগুলি তাঁর ব্যাখ্যামূলক প্রকল্পের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। কাজেই তাঁর প্রকল্প অভ্রান্ত প্রমাণিত হল তখন নিউটনের মতবাদ গ্রহ সম্পর্কীয় বিভন্ন সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করা হতে লাগল।

.....

নির্ণায়ক পরীক্ষণ বলতে কি বোঝায় ? নির্ণায়ক পরীক্ষণ কি সত্যই নির্ণায়ক?

যে পরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণের ফলে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করা হয় এবং অন্যটিকে বর্জন করা হয় , তাকে বলে নির্ণায়ক পরীক্ষণ।

আলোকের প্রকৃতি সম্পর্কেদুটি বরুদ্ধ প্রকল্পের মধ্যে বহুদিন ধরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছিল। প্রকল্প দুটি হল নিউটনের কণিকাবাদ (Hc) এবং হাইজেন্‌জ্‌-এর তরঙ্গবাদ(Hw)।

কণিকাবাদ (Hc) অনুসারে – আলোকরশ্মি হল প্রচণ্ড গতিশীল অসংখ্য কণিকার ধারা।

অপরপক্ষে তরঙ্গবাদ (Hw) অনুসারে আলোকরশ্মি হল বিশেষ প্রকারের তরঙ্গবাদ।

উভয় প্রকল্পই আলোকের প্রতিফলন,প্রতিসরণ প্রভৃতি আলোকের আচরণ সংক্রান্ত সকল জ্ঞাত তথ্যই সমান স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে পারত। কণিকাবাদ থেকে একথা নিঃসৃত হয় যে, আলোক বায়ুতে যে বেগে চলে

জলের মধ্যে তার চেয়ে বেশী বেগে চলবে। অপরপক্ষে,তরঙ্গবাদ থেকে একথা নিঃসৃত হয় যে, আলোক বায়ুতে যে বেগে চলে জলের মধ্যে চলবে তার চেয়ে কম বেগে। অর্থাৎ Hc থেকে নিঃসৃত হল অ1 অর্থাৎ আলোর গতিবেগ বায়ুতে যা জলের মধ্যে তার চেয়ে বেশী। আর Hw থেকে নিঃসৃত হয় অ2 অর্থাৎ আলোর গতিবেগ বায়ুতে যা জলেতে তার চেয়ে কম।

প্রথমে আলোর গতিবেগ মাপা সম্ভব হয় নি। অনেক বছর পরে জল,বায়ু প্রভৃতির মাধ্যমে আলোকের গতিবেগ মাপা যখন সম্ভব হল তখনই নির্ণায়ক পরীক্ষণ দিয়ে অ1 আর অ2 –এর (সুতরাং Hc আর Hw এর) কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য, কোনটি বর্জনযোগ্য তা নির্ণয় করা সম্ভব হল।

ফরাসী বিজ্ঞানী ফুকো পরীক্ষা করে দেখাতে সমর্থ হন আলোকের গতিবেগ বায়ুতে যা জলেতে তার চেয়ে কম অর্থাৎ তিনি দেখান অ1 মিথ্যা, অ2 সত্য। সুতরাং Hc মিথ্যা প্রমাণিত হল আর Hw সমর্থিত হল।

নির্ণায়ক পরীক্ষণ প্রক্রিয়াকে যত বেশী চূড়ান্ত বলে মনে করা হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত, বিংশ শতাব্দীতে কিন্তু আর ততটা চূড়ান্ত মনে করা যায় না, কারণ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা নিউটনের Hc কে (অর্থাৎ কণিকাবাদকে) আবার বাঁচিয়ে তোলেন। তাঁর দেখান এমন অনেক ব্যাপার আছে যা Hw বা তরঙ্গবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, Hc বা কণিকাবাদ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্ট প্রভৃতির ব্যাখ্যায় আলোককে তরঙ্গধর্মী বলে মনে করা যায় না, কণিকাধর্মী বলে প্রতিভাত হয়।

সুতরাং নির্ণায়ক পরীক্ষণ প্রকৃতপক্ষে নির্ণায়ক বলে গণ্য হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আরো দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্প গ্রহণ করে দেখানো যায়। পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্প- Hs অর্থাৎ পৃথিবী গোলাকার এবং Hf অর্থাৎ পৃথিবী চ্যাপ্টা।

এখন যদি Hs অর্থাৎ পৃথিবী গোলাকার – সত্য হয়, তাহলে কোন জাহাজ তীর থেকে ক্রমশঃ দূরে গেলে কোন একসময়ে জাহাজের মাস্তুল শীর্ষক কেবল দেখা যায় , জাহাজের নিম্নাংশ আর দেখা যায় না। কেননা; নিম্নের চিত্র থেকে দেখা যায় যে, জাহাজের নিম্নাংশ অর্থাৎ জাহাজের খোল থেকে যে আলো চোখে এসে পৌঁছলে খোল দেখা যেত, সেই আলো একসময়ে আর দর্শকের চোখে এসে পৌঁছায় না।

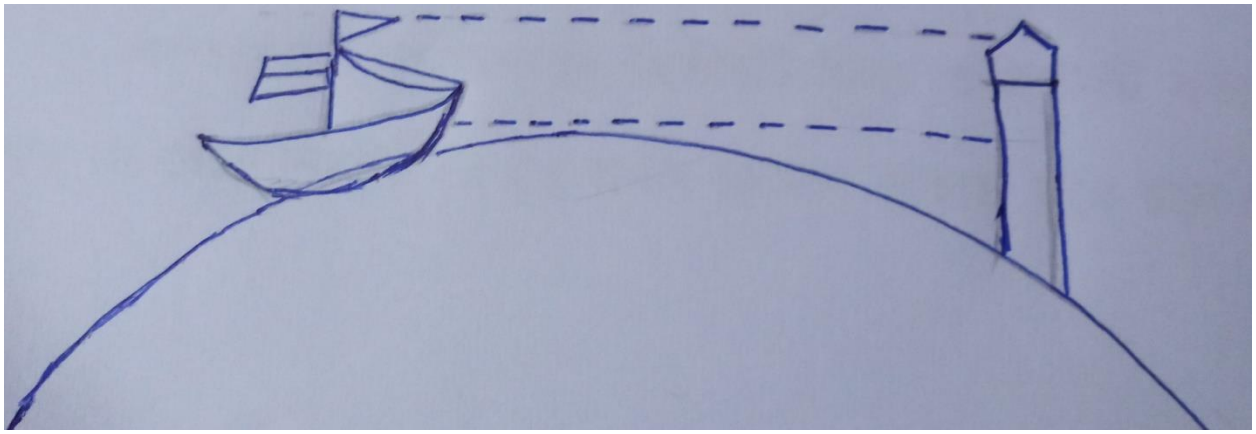

অপরপক্ষে, Hf যদি সত্য হয়, তাহলে একসময়ে জাহাজটি সমগ্রভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবে। অপরপক্ষে নিম্নের চিত্র থেকে দেখা যাবে যে, Hf যদি সত্য হয় , তাহলে একসময়ে জাহাজটি সমগ্রভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কারণ Hf অনুসারে ভূপৃষ্ঠ সমতলে হওয়ায় সমগ্র জাহাজ থেকে আলো এসে দর্শকের চোখে পড়বে (জাহাজ কাছে থাকলে) নয়তঃ জাহাজের কোন অংশ থেকেই আলো এসে চোখে পড়বে না। (জাহাজ বহুদূরে চলে গেলে)।

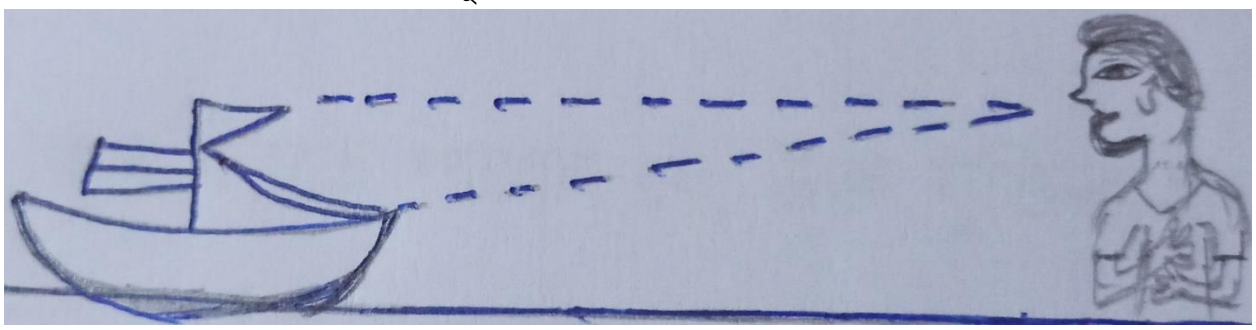

বস্তুতঃপক্ষে দেখা যায় যে, দ্বিতীয়টি মিথ্যা ও প্রথমটি সত্য, কেননা; Hs থেকে নিঃসৃত হয় C1 অর্থাৎ চলমান জাহাজ দূরে চলে গেলে তার মাস্তুলশীর্ষ দেখা যায়। অপরপক্ষে Hf থেকে নিঃসৃত হয় C2 অর্থাৎ একসময়ে সমগ্র জাহাজটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য C1 ও C2 পরস্পর বিরুদ্ধ। এখন বস্তুতঃ দেখা গেল C2 মিথ্যা আর C1 সত্য। সুতরাং Hs সমর্থিত হল। অতএব দাবী করা যায় Hf মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল। যে যুক্তিতে Hf এর মিথ্যাত্ব প্রমাণের দাবী করা হল সেই যুক্তিটি নিম্নরূপঃ-

যদি এমন হয় যে, Hf , তাহলে C2 ।
এমন নয় যে, C2
∴ এমন নয় যে, Hf

এখন, Hf এর সমর্থকরা কিন্তু বলতে পারেন যে, উক্ত যুক্তির প্রধান আশ্রয়বাক্যটি মিথ্যা। কাজেই তার সিদ্ধান্ত যে সত্য তার নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং তারা বলতে পারে যে, Hf থেকে C2 নিঃসৃত হয় না। Hf থেকে C2 নিঃসৃত করার জন্য আর একটি প্রকল্পের সত্যতাকে ধরে নেওয়া হয়েছে। সেই প্রকল্পটি হল- Hr অর্থাৎ আলো চলে সরলরেখার পথ ধরে, যার মানে C2 নিঃসৃত হয় Hf এবং Hr থেকে। কাজেই Hf এর সমর্থকরা বলবে যে,

যে যুক্তিতে Hf এর মিথ্যাত্ব দাবী করা হয়েছে সেই যুক্তিটি আসলে নিম্নরূপঃ-
যদি এমন হয় যে, Hf এবং Hr তাহলে C2 ।
এমন নয় যে, C2

∴ এমন নয় যে, Hf এবং Hr অর্থাৎ

~(Hf . Hr) অর্থাৎ

~Hf v ~Hr ।

অর্থাৎ হয় Hf মিথ্যা অথবা Hr মিথ্যা। এখন Hf –এর সমর্থকরা বলতে পারে যে, Hr ই মিথ্যা, Hf-ই সত্য। সুতরাং নির্ণায়ক পরীক্ষণ প্রকৃতপক্ষে নির্ণায়ক নয়।

.....

Explain with examples the joint method of agreement and difference after Copi . How does Copi's joint method differ from Mill ?

প্রথমেই উল্লেখ্য যে, সংযুক্ত অন্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কপি মিলকে অনুসরণ করেন নি। একটি নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

মিলের অন্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতি হল অন্বয়ী পদ্ধতিরই একটি বিশেষরূপ-এটিকে বলা যায় দ্বৈত অন্বয়ী পদ্ধতী। অপরপক্ষে কপি'র অন্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতি হল অন্বয়ী ও ব্যাতিরেকী পদ্ধতির যুক্তরূপ।

কপি'র অন্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতির আকার নিম্নরূপঃ-

পূর্বগ	অনুগ	পূর্বগ	অনুগ
ABC	abc	ABC	abc
ADE	ade	BC	bc

সুতরাং A এবং a কার্য-কারণ সম্পর্কে যুক্ত।

অন্বয়ী পদ্ধতি অ-কার্য অপসারণ করতে পারে, যদিও অ-কারণ অপসারণ করতে পারে না। অপরপক্ষে ব্যাতিরেকীপদ্ধতী অ-কারণ অপসারণ করতে পারে, যদিও অ-কার্য অপসারণ করতে পারে না। সুতরাং অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যাতিরেকী পদ্ধতি যুক্ত করে প্রয়োগ করলে অ-কারণও অপসারণ করা যায়। আবার অ-কার্যও অপসারণ করা যায়। ফলে কেবল অন্বয়ী পদ্ধতি প্রয়োগলব্ধ সিদ্ধান্তের যে স্মভাব্যতা বা কেবল ব্যতিরেকী পদ্ধতির প্রয়োগলব্ধ সিদ্ধান্তের যে সম্ভাব্যতা তার থেকে অনেক বেশী সম্ভাব্যতা কপি'র আলোচ্য সংযুক্ত লব্ধ সিদ্ধান্তের।

মনে করা যাক, 'a'-র কারণ নির্ণয় করতে চাই। বামধারের দৃষ্টান্তগুলি থেকে বোঝা যায়, b,c,d,e-এদের কোনটিই 'A' র কার্য হতে পারে না, কেননা এই দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যায় যে, A আছে অথচ b,c নেই (দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে),

A আছে , অথচ d, e, নেই (প্রথম দৃষ্টান্তে)। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত নিয়ে অ-কারণ অপসারণ করা যায় না, বলা যায় না যে, B,C,D,E, 'a'-র কারণ নয় - 'A'-ই 'a'-র কারণ।

'A'-'a' র কারণ –এই দাবী করলে আপত্তি হতে পারে যে, 'a'-র কারণ প্রথম দৃষ্টান্তে 'A',দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'c'। এই অপত্তি খণ্ডিত হয় ডানদিকের দৃষ্টান্তগুলি নিলে । এই দৃষ্টান্তগুলি নিলে বোঝা যায় B বা c-a এর কারণ হতে পারে না, কেন্না দেখা যায় (ডান্ধারের) দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে B,C, আছে, অথচ a নেই। কিন্তু আপত্তি উঠতে পারে যে, 'a' র কারণ 'A' নয়, 'a'-র প্রকৃত কারণ হল D(বা E)। এইআপত্তি খণ্ডন করা যায় যদি ডানধারের দৃষ্টান্তের মত আরো দুটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করি যদি নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তগুলি গ্রহণ করি-

ADE---ade

DE---de

সেক্ষেত্রে অন্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতি নিম্নরূপ পরিগ্রহ করবে-

পূর্বগ	অনুগ	পূর্বগ	অনুগ	পূর্বগ	অনুগ
ABC	abc	ABC	abc	ADE	ade
ADE	ade	BC	bc	DE	de

সুতরাং A হল 'a' র কারণ

বা

A ও a কার্যকারণ সম্পর্কে যুক্ত

মূর্ত উদাহণঃ-কয়েকজন ছাত্র একটি ছাত্রাবাসে খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং কে কি খেয়ে ছিল তার সন্ধান নিয়ে যা জানা গেল তা নিম্নে সারণীর অকারে উল্লেখ করা হল ও তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা হলঃ-

প্রথম ছাত্র – ভ,ছ,ম,ই,ক,-প / প্রঃ ছাঃ-ভ,ছ,ম,ই,ক,-প

দ্বিতীয় ছাত্র –র,অ,ই,ক,-প/ তৃঃ ছাত্রঃ-ভ,ছ,ম,ই,~ক-~প

উক্ত আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কাঁকড়া খাওয়াই পীড়িত হওয়ার কারণ।যাদি ডানদিকের দৃষ্টান্তগুলির বদলে ,

প্রথম ছাত্র- ভ,ছ,ম,ই,ক-প

তৃতীয় ছাত্র – ভ,ছ,ম,~ই,ক,-~প।

এই দৃষ্টান্তগুলি পাওয়া যেত, তাহলে অন্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে আসতে হত যে, ওদের পীড়িত হওয়ার কারণ হল 'ইলিশ মাছ খাওয়া'।

মিলের অন্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতির ব্যাখ্যা কিন্তু কপি'র অন্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতির উক্ত ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন। মিলের সংযুক্ত পদ্ধতিতে ব্যতিরেকী পদ্ধতির কোন ভূমিকা-ই নেই। সেখানে আছে শুধু অন্বয়ী পদ্ধতিরই দ্বৈত প্রয়োগ। মিল দু'রকমের দৃষ্টান্তগুচ্ছ গ্রহণ করেছেন- সদর্থক ও নঞর্থক। সদর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছে দেখানো হয়েছে যে, অমুক থাকলে

তমুক থাকে। যেমন A থাকলে a থাকে। অন্যদিকে নঞর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছে দেখানো হয়েছে যে, অমুক না থাকলে তমুক থাকে না। যেমন A না থাকলে a থাকে না।

মিল এই পদ্ধতির সূত্র নিম্নলিখিত প্রকাশ করেছেন –"আলোচ্য ঘটনার দুই বা ততোধিক সদর্থক দৃষ্টান্তে যদি একটি মাত্র অবস্থা সমভাবে উপস্থিত থাকে এবং যদি এই অবস্থাটি আলোচ্য ঘটনার দুই বা ততোধিক নঞর্থক দৃষ্টান্তে সমভাবে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে এই অবস্থাটি অলোচ্য ঘটনার কার্য বা কারণ বা কারণের অপরিহার্য অংশ।

মিলের পদ্ধতিটির আক্ষরিক দৃষ্টান্ত নিম্নরূপঃ-

সদর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছ	নঞর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছ
ABC – abc	BC – bc
ADE – ade	BD – bd
AFG – afg	CD – cd

সুতরাং A হল a – র কারণ।

বাস্তব উদাহরণঃ- টেস্ট ক্রিকেটের কয়েকটি খেলায় ভারতীয় দলে গাওস্কর থাকলে ভারত জয়লাভ করে এবং গাওস্কর না থাকলে ভারত পরাজিত হয়। অন্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, গাওস্করের উপস্থিতি ভারতের জয়লাভের কারণ।

সুতরাং দেখা গেল মিলের পদ্ধতিটির সঙ্গে কপি প্রদত্ত পদ্ধতিটির অনেক পার্থক্য। বস্তুতঃপক্ষে বলা যায় যে, একই নামে দুটি ভিন্ন পদ্ধতি।দুই ভিন্ন পদ্ধতিকে একই নামে অভিহিত করা বিভ্রান্তিকর। তাই মিলের পদ্ধতিকে দ্বৈত অন্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতি নামে অভিহিত করাই শ্রেয়।

.....